এসডিজির: সংলাপ থেকে বাস্তবায়নে অগ্রগতি হলো কতটা

ঢাকায় সম্প্রতি জাতীয় এসডিজি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগের এসডিজি সম্মেলনের ধারাবাহিকতা, এবারের সম্মেলনের অর্জন—এ বিষয়গুলো নিয়ে লিখেছেন

বাংলাদেশ সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ জাতীয় এসডিজি সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। সম্মেলনে অর্জনের হিসাব ঘাটতি, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের সঙ্গে এসডিজির সমন্বয় এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা—এ রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। কিন্তু এগুলো কতটা নতুন? ২০২৩ সালের অঙ্গীকার ও নাগরিক-এজেন্ডা নির্ধারণের পর ২০২৬ সালের সম্মেলন কি একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন কাঠামো দিতে পেরেছে, নাকি পরিচিত সমস্যাগুলোকে নতুন সময়সীমা ও ভাষার পুনর্গঠন করেছে? এই লেখায় সম্মেলনের অর্জন, তার ২০২৩ সালের উচ্চাভিলাষ এবং ২০৩০ পর্যন্ত বাংলাদেশের করণীয় নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছি।

এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে নতুন নয়। প্রায় দুই দশক ধরে আমার গবেষণায় এসডিজি-৪ এসডিজির দেখভালের অসম সাফল্য, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা এবং বেঞ্চিক লক্ষ্য নির্ধারণের প্রকৃত প্রভাব পরীক্ষা করেছি। এই গবেষণাগারগুলো একটি সাধারণ শিক্ষা সামনে আনে : বৈশ্বিক লক্ষ্য মনোযোগ ও অঙ্গীকার তৈরি করতে পারে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য তথ্য, সক্ষম প্রতিষ্ঠান ও দায়বদ্ধতাহীন জাতীয় কৌশল ছাড়া লক্ষ্য নিজে ফল তৈরি করে না।

বাংলাদেশের ২০২৬ সম্মেলন কী অর্জন করল?

এই পটভূমিতে ঢাকায় সদ্য সমাপ্ত জাতীয় এসডিজি সম্মেলন (নেগোশিয়েটিং ফিউচার-ইয়ার স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাচিভিং এসডিজিস: পলিসি, পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রায়োরিটিজ) গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনে অন্তত তিনটি বাস্তব সমস্যা স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে।

প্রথমত, ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের আনুমানিক ৪২১ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। এই হিসাবটি ইকোনমিক রিলেশন্স ডিভিশনস (ইআরডি)-র ‘ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স অ্যাসেসমেন্ট ও এসডিজি ফাইন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি’ থেকে এসেছে। ‘বাংলাদেশ আপডেটেড ফাইন্যান্সিং রোডম্যাপ টু অ্যাচিভিং এসডিজিস’ শীর্ষক জাস্টিফাইং বিবরণী অর্থায়নের পরিকাঠামো সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার, সমন্বিত পদক্ষেপ, উন্নত শাসন ও কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এসডিজির শেষ পর্যায়ে লক্ষ্যচ্যুত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। দক্ষতা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজস্ব, সামাজিক সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুই এজেন্ডার সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে।

তৃতীয়ত, সরকারি তথ্যের নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সরাসরি আলোচনা হয়েছে। ভুল বা প্রচলিত তথ্য নীতি প্রণয়নকে বিকৃত করে, অগ্রগতি যাচাই কঠিন করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা কমায়। সমাজে সুবিধাপ্রাপ্ত

জনসম্পদ বিশেষ করে, মাইগ্রেশনের ব্যবহারের নীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ সূচক প্রকাশের আগাম ক্যালেন্ডার—এসব প্রস্তাব ইতিবাচক।

২০২৩ থেকে ২০২৬: নতুন কী?

এই স্বীকৃতিগুলোকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। তবে ২০২৬ সালের সম্মেলন শূন্য থেকে শুরু করেনি। এটি ২০২৩ সালের সরকারি অঙ্গীকার, নাগরিক সংলাপ ও এজেন্ডা নির্মাণের ওপর দাঁড়িয়েছে। সরকারের 'এসডিসি সামিট টুয়েন্টি টুয়েন্টি থ্রি: বাংলাদেশ কান্ট্রি কমিটমেন্টস' নথিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০৪টি পরিবেক্ষণ সূচকের মধ্যে ৬৬ টি এসডিজির সঙ্গে সরাসরি যুক্তেরক্তহা বলা হয়েছিল। একই সময়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্মও ঢাকা কেন্দ্রিক সংলাপ করেনি।

সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্ম ইন টুয়েন্টি থার্টিস থ্রি: আ ভিউ অন এজেন্ডা বিয়িং' অনুযায়ী, তখন প্ল্যাটফর্মের ১৩৪টি অংশীদার সংগঠন ছিল; বিভিন্ন সংলাপ ও সম্মেলনে ১ হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষ সরাসরি অংশ নেন, যাঁদের ৭০০-এর বেশি ছিলেন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। ১১টি নীতি-সংক্ষিপ্তসার, ৫ হাজার ৭৫ তরুণের জরিপ, ২০টি ফোরাম গ্রুপ আলোচনা এবং তিন উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সামাজিক নিরীক্ষাও হয়েছিল।

অতএব, সদ্যসম্পন্ন সম্মেলনের প্রধান নতুন্ত বিস্তৃত প্রতিনিধিত্বে খোজা ঠিক হবে না -সেটি ২০২৩ সালের প্লাটফর্মের একটি শক্তি ছিল এবং ১৬০টি বেশি অংশীদার ও সহযোগী সংগঠনের বর্তমান নেটওয়ার্ক সেই ভিত্তিকে আরও বড় করেছে। ২০২৬-এর প্রকৃত সংযোজন হলো শেষ পাঁচ বছরের জরুরি সময়সীমা, ৪২১ বিলিয়ন ডলারের হালনাগাদ অর্থায়ন-চাহিদা, এলডিসি উত্তরণের সঙ্গে সমন্বয় এবং তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার আনা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত উপকরণ ও সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে এখনো পরিষ্কার নয়, এই অগ্রাধিকারগুলো কীভাবে লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়ন কাঠামোয় রূপ নেবে। কোনো এসডিজি বা উপ-লক্ষ্য কতটা পিছিয়ে, ২০৩০ পর্যন্ত তার বার্ষিক অর্থায়নের কী, কোন প্রতিষ্ঠান দায়ী, কর অর্থ প্রয়োজন, কোন স্বাধীন তথ্য দিয়ে ফল যাচাই হবে এবং অগ্রগতি না হলে কখন ও কীভাবে পথ সংশোধন করা হবে—এমন একটি প্রকাশ্য ম্যাট্রিক্স নাই ২০২৩-এর 'এজেন্ডা রিফর্ম' থেকে ২০২৬-এর 'বাস্তবায়ন ও ফল প্রধান' উন্নয়নের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রমাণ হতে পারত। সম্মেলন সঠিক মুখ তুলেছে; এখন পরীক্ষা হচ্ছে, সেগুলোর উন্নত ডেভলপ প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসন ব্যবস্থা তৈরি হয় কি না।

নাগরিকের কণ্ঠ থেকে প্রমাণ ও জবাবদিহি

বিশ্বব্যাপী সব রাষ্ট্র একইভাবে এসডিজিকে সফল করতে নয়। কোনো সরকার বৈশ্বিক লক্ষ্যকে নীতি সমতা, অবহেলিত সমস্যা শনাক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহির আওতায় আনার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। অন্য ক্ষেত্রে এসডিজি আমলাতান্ত্রিক সংহতি ও আনুষ্ঠানিকতার ছদ্মাবরণ হয়ে ওঠে—যার মাধ্যমে বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ছাড়াই অঙ্গীকার প্রদর্শন করা যায়। তখন লক্ষ্য আনুষ্ঠানিকতা হয়, রঙিন প্রদীপ প্রদর্শিত হয়, প্রতিবেদন জমা পড়ে এবং মডেল প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক প্ররোচনা, সেবা প্রদানের সক্ষমতা ও মানুষের অভিজ্ঞতা খুব বেশি বদলায় না।

এই ঝুঁকি মোকাবিলায় নাগরিকের ভূমিকা অপরিহার্য। গবেষণা সামর্থ্যহীন জনবল আর উন্নয়নমুলক এফেক্ট পলিসি ক্যাপাসাবিলিটিজ-এ প্রকাশিত মন্থর আর দেশের, লং টু গো: দ্য রোল অব পিপলস এজেন্সি ইন দ্য ফাইনাল

ইয়ার্স অব দ্যা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস' নিবন্ধে আমরা যুক্তি দিয়েছি, এসডিজির অবশিষ্ট সময়ে মানুষের এজেন্সি অর্থাৎ নিজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, মোবিলাইজ এবং প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহি করার ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিষ্ক্রিয় সুবিধাভোগীদের কাছে ওপর থেকে পৌঁছে দেওয়ার কোনো প্যাকেজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা প্রদান, প্রতিজ্ঞাতা জানানোর ব্যবস্থা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং সক্ষম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।

আশার আলো নাগরিক রিভিউ বা বিবরণমাত্র এই অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। জাতিসংঘের হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামে সরকারগুলোর বিবরণান্তরের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বাধা ও শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের 'বাংলাদেশ ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ ২০২৫' প্রমাণভিত্তিক নীতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ভিউসনাভ কেবল আন্তর্জাতিক স্তরের প্রদর্শনের জন্য সরকারের তৈরি স্বসজ্জিত প্রতিবেদন নয়; এটি নিয়মিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জবাবদিহিতামূলক পর্যালোচনার হওয়া উচিত।

একটি মানবসম্মত জীবনযাত্রার দেখভালের ছায়ায় অগ্রগতি যেভাবে বা পেছনে গেছে, কারা বাদ পড়েছে, অর্থায়ন ও প্রতিষ্ঠানের বাধা কোথায়, এবং সরকারি দাবি ও নাগরিকের অভিজ্ঞতার মধ্যে অমিল আছে কি না। নাগরিক সমাজকে প্রতিবেদন তৈরির শেষ পর্যায়ে শুধু অনুমোদন দেওয়ার জন্য ডাকা যথেষ্ট নয়। অলৌকিক নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, ফলবাচক ব্যাখ্যা এবং নীতিগত সংশোধনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রয়োজনে স্বাধীন বা যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশের সুযোগও থাকতে হবে।

এই জায়গাটায় সদ্য সমাপ্ত সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্ম ফর এসডিজিস, বাংলাদেশে ১৬০টির বেশি অংশীদার ও সহযোগী সংগঠনের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক। সম্মেলনে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নাগরিক সমাজের বিস্তৃত অংশ উপস্থিত ছিল। ফলে সম্মেলনটি একাডেমি বা গবেষকদের ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এতে যেমন সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তবতাও উঠে এসেছে। তবে সবচেয়ে বড় বড় অর্জন হলো—এমন হওয়া উচিত নয়, বরং প্রগতি এবং অংশগ্রহণের পরবর্তী ধাপ মাত্র।

২০২৩-এর অভিজ্ঞতা দেখায়, প্ল্যাটফর্ম নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা, দক্ষাতা ও অগ্রাধিকার দৃশ্যমান করতে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা তৈরি করেছে। ২০৩০ পর্যন্ত অল্প সময়ে শুধু আরও কর সংগ্রহ যথেষ্ট নয়; সেই অর্থকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যয়, ভালো নীতি, ব্যয় ও বাস্তবায়নের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নাগরিকের অভিজ্ঞতা তথ্যের নীতিগত শক্তি পায়, যখন তা সরকারি সূচকে যাচাই বা প্রশ্ন করতে পারে, নির্দিষ্ট সেবা-ব্যবহারের কারণ চিহ্নিত করে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয় ও সংশোধনের মুখোমুখি করে।

এখানে সংলাপ ও গবেষণা পরস্পরের বিকল্প নয়। সংলাপ বসে নেয় কোন সমস্যা মানুষের কাছে জরুরি এবং সরকারি তত্ত্বের আড়ালে কারা বাদ পড়েছেন। পদ্ধতিগত, নিচ থেকে উঠে আসা গবেষণা যাচাই করে সমস্যার গভীর কত, কোন ক্ষেত্র সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, কোন্ নীতিগত বাধা দায়ী এবং কোন্ হস্তক্ষেপে ফল দিচ্ছে। শেষ পাঁচ বছরে সম্মেলনের মূল্য শুধু বড় বড় বাক্তিব্যময় কড়া শব্দে গোল, তা দিয়ে নয়; সেসব কষ্টের ভিত্তিতে কোন চাক্ষুষযোগ্য সিদ্ধান্ত, দায়িত্ব, বাজেট ও অনুশাসনব্যবস্থা তৈরি হলো, তা দিয়ে ও মাপতে হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মেলনটি বাংলাদেশের পরবর্তী বিকাশধারা ও ২০৩০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য নাগরিক সমাজ ও স্বাধীন গবেষকদের সমন্বয়ে একটি প্রমাণভিত্তিক পর্যালোচনা কাঠামো প্রস্তাব করতে পারে।

পিছিয়ে থাকা প্রতিটি অগ্রাধিকার সূচকে স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক তথ্য পাশাপাশি রাখা; জটিল সুচক ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী নিয়ে ফল ব্যাখ্যা করা; মহানগরভিত্তিক সংশোধনী পদক্ষেপ, ব্যয় ও সময়সীমা প্রকাশ করা এবং নির্দিষ্ট ভিত্তিতে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অগ্রগতি আবার যাচাই করা। স্বাধীন বা ছায়া প্রতিবেদন এই প্রক্রিয়ার পরিপূরক হতে পারে। এতে সরকারের প্রদর্শন হ্রাসের কিছুটা কম হবে, কিন্তু অংশগ্রহণ গতিময় হবে প্রমাণ, বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতায়।

এই তুলনা থেকে একটি মিশ্র চিত্র পাওয়া যায়। ২০২৩ থেকে ২০২৬-এর মধ্যে অংশীদার নেটওয়ার্ক বড় হয়েছে, অর্থায়ন ও তথ্যের ঘাটতি আরও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং আলোচনা বেশ তীব্র দরবারে কৌশলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এগুলো বাস্তব অগ্রগতি। কিন্তু সম্মেলন ও প্রতিবেদন থেকে এখনো এমন কোনো প্রকাশ্য, লক্ষ্যভিত্তিক ফাসল-শৃঙ্খল দেখা যায় না, যার মাধ্যমে নাগরিকের কণ্ঠ থেকে নীতিগত সিদ্ধান্ত, সেশনে থেকে বাস্তবায়ন, এবং বাস্তবায়নে থেকে স্বাধীনতাকে যাচাই করা ফল পর্যন্ত সংযোগটি নিয়মিত অনুকরণ করা যাবে। ২০২৬-পরবর্তী কাজের সবচেয়ে জরুরি ক্ষেত্র সম্ভবত এটিই।

শেষ পাঁচ বছরের পরীক্ষা

এসডিজির প্রয়োজনীয়তা এখন শেষ হয়ে যায়নি। লেখার ঘাটতি, লিঙ্গবৈষম্য, অপুষ্টি, অনিরাপদ কর্মসংস্থান, জলবায়ু ঝুকি ও অসম জীবন-সম্ভাবনা—এসব সমস্যা বাস্তব এবং জরুরি। কিন্তু অঙ্গীকারের গভীরতা কেবল সম্মেলনের পুষ্টভূমিতে নয়, বরং সেই অঙ্গীকারের গভীরতা কতটুকু এবং লক্ষ্য অর্জনে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করে। সম্মেলনগুলোর সফল সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ যদি তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত না করে, তবে এসব উদ্যোগ কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আমলাতান্ত্রিক গতিশীলতা এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

২০২৩ সালের প্রকাশ্য অবদান ছিল সমস্যা, বেদনা ও নাগরিক অগ্রাধিকারের দৃশ্যমান করা। ২০২৬ সালের পরীক্ষা ভিন্ন : সেই এজেন্টকে এখন লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়ন কাঠামোয় রূপ দিতে হবে। প্রতিটি পিছিয়ে থাকা সূচকের জন্য বর্তমান অবস্থা, ২০৩০-এর লক্ষ্য, বার্ষিক মাইকফিল্ড, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনীয় অর্থ, তথ্যের উৎস এবং স্বাধীন যাচাইয়ের পথটি প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সিটিজেন্স প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এখানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন তথ্যের দফা সংলাপ আয়োজনের পাশাপাশি এটি নির্দিষ্ট সূচকগুলোতে নাগরিকের অভিজ্ঞতা ও সরকারি তথ্য পাশাপাশি রেখে অগ্রগতি যাচাই, বাস্তবায়ন-বাধার কারণ শনাক্ত এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশোধনী পদক্ষেপ অনুকরণ করতে পারে। এতে নাগরিক অংশগ্রহণ শুধু মতামতের জানার সুযোগে সীমিত থাকবে না; তা নীতিগত জবাবদিহির স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সম্মেলনের মূল্য তার ঘোষণায় নয়, পরবর্তী পদক্ষেপে নির্ধারিত হবে। বাংলাদেশ কি নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করবে, অগ্রাধিকারগুলোতে অর্থায়িত ও বাস্তবায়নের নীতিতে রূপ দেবে, ব্যর্থতা স্বীকার করে পথ সংশোধন করবে এবং নাগরিকের কণ্ঠকে স্বাধীন প্রমাণের সঙ্গে যুক্ত করবে? ২০৩০ পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়ে এ প্রশ্নগুলোর দৃশ্যমান উত্তরই দেখাবে—আমরা সংলাপ থেকে বাস্তবায়নে সত্যই কতটা এগিয়েছি।

লেখক: **এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ**।